তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের,মঙ্গলই হবে বোধ হয়।যোগাযোগ হলে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজেকর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্য ছুটি পাওয়া যায় আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তা হলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে-খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা।

সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না, মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ করে চলে গেছে। একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রুর কুণ্ডলীতে জলীয় অভিশাপ ধীরে-ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে। বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে-নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দুধারে বাঁশঝাড় আর বড়-বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্য আরো দু-জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ-অভিযানে তারা এসেছে কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ন হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলো মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্যব্যয় না করতে সেই গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর তিনজনে কোনো রকমে প্রবেশ করবেনও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার সীমানা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু-একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য, কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে-পায়ে পথ যেন ছড়িয়ে-ছড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনাময় বেশ একটু অস্বস্তিবোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে-ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে-ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ়

অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।
সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ-আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছইয়ের ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে-থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।
কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে 'এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।'
ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কি না কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্থ না হলে এই ক্যানেস্তারা-নিনাদই তাকে তফাত রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।
মহানগরী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কী করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে-ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব ধ্বংসাবশেষ কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।
রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনো ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব-কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে; জাদুঘরের নানা প্রাণীদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।
দু-তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে-একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা পচা গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাদ, ধসে-পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।
এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতি প্রতিনিধি হিসেবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়তো কেউ আগে কখনো পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ, একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলেস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে-থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।
তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্য আপনার দুটি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজন নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনো রকমে শতরঞ্জির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অন্যজন পানপাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।
রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে-ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে-অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হলে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে-ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতিমুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি উপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গায় আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে-ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ-অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু-সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথ রাতে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন একসময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না!

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। একসময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্য শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্যসমেত বড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকেপড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে-ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করার জন্যই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাতনাটার ওপর বসার চেষ্টা করবে ও থেকে-থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাতনা মৃদুমন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাতনা লক্ষ করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে-যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, 'বসে আছেন কেন? টান দিন।'

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে, এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুন বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে-যাওয়া ফাতনা আবার ভেসে উঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুতভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে। পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিস্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয়

আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।
একসময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্য শিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ন হয়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা করে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন 'কে আবার বলবে। এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এলো যে।'
আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।
যে-ভগ্নস্তূপে গত রাতে ক্ষণিকের জন্য একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেননি।
এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ করেছেন, শুধু কাছ থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন! একদিন যেন সেই এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।
আপনাদের পরিবেশন করতে-করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে।
যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে--সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।
খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, 'একটু শুনে যাও মণিদা।'
মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে-আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে আপনারা শুনতে পাবেন না। শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, 'মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কী যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কী বলব।'
মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?'
'হ্যাঁ, কেবলই বলছেন 'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কী যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝালে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে!'
'হুঁ, এ তো বড় মুশকিল দেখছি। চোখ থাকলেও না-হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।'
ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ন ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পারেন। যামিনী এবার কাতরকণ্ঠে অনুনয় করবে, 'তুমি একবারটি চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।'
'আচ্ছা তুই যা, আসছি।'মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, 'এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতেই মরবে না।'
ব্যাপারটা কী এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, 'ব্যাপার আর কী! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূরসম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে বলে গেছল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।'
আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, 'নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?'

'আরে সে বিদেশে গেছল কবে, যে ফিরবে! নেহাত বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হলে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?'

'যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?

'তা আর জানে না! কিন্তু মায়ের কাছে বলার উপায় তো নেই! যাই, কর্মভোগ সেরে আসি!'বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো বলে ফেলবেন, 'চলো, আমিও যাব।'

'তুমি যাবে!' মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে। 'হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে?'

'না, আপত্তি কিসের!'বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানালা, তাও বন্ধ, বাইরে আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তপোশে ছিন্ন-কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তপোশের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে : 'কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?'

মণি কী যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, 'না মাসিমা, আর পালাব না।'

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। কটি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে-ধীরে সময়ের সাগরে শিশির-বিন্দুর মতো ঝরে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, 'আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন করে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুনেছি।'

বৃদ্ধা এতগুলো কথা বলে হাঁফাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরে কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কী ধীরে-ধীরে গলে যাচ্ছে ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরি এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, 'যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিটখিট করে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইট আঁকড়ে এখানে-সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কী না করছে!'

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, 'যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

ধরা-গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথা নড়চড় হবে না।'

তারপর বিকেলে আবার গরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে! আপনারা তিনজনে একে-একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে 'আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল।'

আপনি হেসে বলবেন, 'থাক না। এবারে পারিনি বলে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে!'

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে এক শ না দেড় শ বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতি-বিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল আপনার বন্ধুরা হয়তো আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন--'ফিরে আসব।'

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখনো আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাটো বাধা-বিড়ম্বিত কটি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কি না আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন, সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শ পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, 'ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?' আপনি শুনতে-শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত-যাওয়ার তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুশায়াময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্য আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।